অনুভবে জয়নুল

দাউদ হায়দার

(বাংলাদেশের স্বনামধন্য কবি দাউদ হায়দার আমাদের জয়নুল চর্চ্চাকে উৎসাহিত করার জন্য সুদূর জার্মানী থেকে একটি লেখা পাঠিয়েছেন। তাঁর সেই অনুভবী লেখাটি আমরা উত্তাসের বন্ধুদের জন্য প্রকাশ করলাম।)

ছবি ও কবিতা লেখাকেই অবন ঠাকুর বলছেন, ছবি লেখা। অবন ঠাকুরের গদ্যও কবিতা। ছবিও কবিতা। বুড়ো আংলার পাতায়-পাতায় ছড়ানো। কবিতা এবং ছবি, কোনোটাই সঠিক বুঝিনা। চেষ্টা করেছি, হয়নি। হবেও না আর।

ছবি দেখলেই যে ছবির খুঁটিনাটি সব বোঝে কেউ, বোধকরি নয়। রঙের ব্যবহার, সূক্ষ দাগ, রেখা, স্পেস একটি ছবিতে নানা মাত্রা, নানা অভিব্যক্তি, নানা প্রকাশ পরতে-পরতে। বিদেশি-দেশি ধ্রুপদী সঙ্গীত তথা মিউজিক শুনতে ভালো লাগে, কিচ্ছু না বুঝেই। বুঝতেই হবে, দিব্যি দেয়নি বাদকও। আলি আকবর খানের মুখে শুনেছিলুম, বোঝার আগে কান তৈরি করতে হয়। ছবি দেখাও সেইরকমই হয়তবা। প্রশ্ন উঠবে, তবে কি শ্রোতা গান শুনবে না, দর্শক কি ছবি দেখবে না? শুনবে এবং দেখবে নিশ্চয়। গান না বুঝে শ্রোতা রেকর্ড কেনে, শোনে। আনন্দিত হয়। ছবি না বুঝেও লোকে কেনে, হোক তা ঘর সাজানোর জন্যে। মূল কথা, ভালো লাগা। মন্দ লাগা। কে আর হিন্দি ফিল্মের অভিনয়, পরিচালনা, শিল্পকলা দেখতে যায়! অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাচুনিকুঁদুনি, প্রেমবিরহ, সাজপোশাক, রূপলাবণ্য, চিসুমচুসুম, দেহের উথালপাতাল-যৌন সুড়সুড়িই দর্শকের প্রিয়। 'রূপ তেরা মাস্তানা' কিংবা 'মেরে সামনেওয়ালে খিড়কি মে এক্ চাঁদ কা টুকরা রাহেতা হ্যায়' – যুব সমাজের ঠোঁটে কেন, সামাজিক চরিত্র কি, দেশিয় সংস্কৃতির গতি কোনদিকে, সমাজবিজ্ঞান কি বলছে, এই নিয়ে কেউ চুল ছিঁড়ছে না।

সাধারণ দর্শকের কাছে চিত্রকলার খুব মূল্য নেই, কোনও দেশেই। মানছি, চিত্রকলা এখন করপোরেট ব্যবসা। ক্রেতা ধনবান, ধনিক। ইন্ডাস্ট্রির বড়োবড়ো অফিস, ড্রয়িংরুম, টাটা-বিড়লা-আম্বানির ঘরে কি সোমনাথ হোড়ের স্কাল্পচার, গণেশ পাইনের, শাহাবুদ্দীনের ছবি শোভিত? যদি থাকে, ঠিকঠাক বোঝে কি আদৌ? বোঝার দায় নেই। সন্দেহ নেই, খুব ফালতু বকছি। কারণও আছে। যারা কোনও বিষয়ে কিছু জানে না, না জেনে, বেশি প্যাঁচাল পাড়ে। সেটা জ্ঞানগম্যি আড়াল করার মহা অস্ত্র।

খালি চোখে দেখলে মনে হয় জয়নুল আবেদিনের ছবি অতীব সাদামাটা, অতীব সহজ। রেখা, টান, রঙ (জল বা তেল), অবয়ব, প্রকৃতি সরল, অনায়াস যেন। অন্তর্ভেদী অবলোকনে ভিন্ন রুপারোপ। কালিতে, চারকোলে, তুলি-ব্রাশে, যাতেই আঁকুন, রঙ-রেখার সূক্ষতার সঙ্গে দেশকাল, দেশমাটির নিবিড় ছন্দ, ঘন সম্বন্ধ। একাডেমিক স্টাইল (কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে পড়াকালীন, তিরিশ দশকে, ব্রিটিশ-ইউরোপিয়ান একাডেমিক অঙ্কন রপ্ত করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে অল ইন্ডিয়া আর্ট এক্সজিবিশনে

Bramhaputra River এঁকে গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন।) পরিহার করেছেন, দেশিয় রিয়ালিজমের গরজেই। ধাঁচ ফোকলোর আর্টের। জয়নুল জানতেন, ফোকলোর আর্টের বিপত্তি, সমস্যা, লিমিটেশন কোথায়। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাও হয় একবার। বলেন, জিওমেট্রিক শেপ, সেমি-অ্যাবস্ট্রাক্ট এই দুইকে মেলানোর প্রচেষ্টা। নেচারের গতি, রঙ কখনও এক নয়। পাল্টায় ঋতুতে-ঋতুতে। বাংলার প্রতিটি ঋতুর মেজাজ ভিন্ন, একই সঙ্গে রিয়ালিস্টিক, একই সঙ্গে অ্যাবস্ট্রাক্ট। ফোক-আর্টে অতীত ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ। শহর ও গ্রামীণ মানুষের জীবন এক নয়, কিন্তু স্ট্রাগল মূলত এক। জীবন সংগ্রাম। বেঁচে থাকা। মানুষ বাঁচে পেশীর জোরে, আত্মবিশ্বাসে।

লক্ষ্যনীয়, তাঁর ছবিতে, রেখায়-অঙ্কনে কৃষক-মাঝি-জেলে-শ্রমিক, এমনকি কাক, গরু প্রচণ্ড ফোর্সফুল। পেশী গা-গতরে অদম্য বলীয়ান। রঙের ব্যবহার বাংলার মাটি জল হাওয়ার। এখানেই জয়নুল বাংলার শিল্পীকুলে অদ্বিতীয়। বলতে চাইছি, বাংলাকেই তাঁর সমস্ত শিল্পের সঘন শিকড় ভেবেছেন। বাংলার শিল্প লোকসংস্কৃতিরই আধার। চারদিকে ছড়ানোছিটোনো জীবনের যে প্রবাহ, জোয়ার, নিত্যদিনের ঘটনা ঘরে-বাইরে, হাটে-ঘাটে-মাঠে, বিষয় খোঁজার জন্যে অঙ্কনশৈলী দরকার নেই। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ দেখেছেন, হুবহু ছেঁকে এনেছেন কালিকলমে, চারকোলে, স্কেচে। গুণটানা মাঝি, হালচাষের বলদ, চাষীর পেশি, শরীর কিংবা বাংলার নবান্ন উৎসব মোটা দাগে এঁকেছেন। রঙের ব্যবহারও বর্ণালী। সোঁদামাটির গন্ধে ভরপুর। তৈরি করেছেন নিজস্ব স্টাইল।

দুই

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর নবান্ন সিরিজ অবশ্যই প্রেরণাদায়ক। যে মাটি-মানুষের কথা বলছেন, সাধারণ মানুষের সংগ্রামের চিত্র আঁকছেন, ১৯৬৯ সালে, সামগ্রিক বিচারে বাংলাদেশের প্রকৃতি, সৌন্দর্য, রূপরস, লোকগাথা, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি প্রাণের স্পন্দন, জোয়ারই দৃঢ়, উজ্জ্বল। আবহমানকালের বাংলা, বাঙালি।

তিন

আমাদের বয়েসী যারা, শিল্পসাহিত্যে একটু দোল খেয়েছি, আর্ট কলেজে গেছি (ঢাকার আর্ট কলেজ জয়নুল আবেদিনেরই তৈরি, কয়েকজন শিল্পীবন্ধুর পরিশ্রমে, নানাবিধ প্রচেষ্টায়।), প্রদর্শনী দেখতে (ঢাকায় তখন আর্ট গ্যালারি ছিল না, কালেভদ্রে প্রদর্শনী আর্ট কলেজেই।), জয়নুল আবেদিন সবসময়ই যে উপস্থিত, তা নয়। কখনও-কখনও দেখেছি। দেখার ভাগ্য আরেকটু বেশি, নয়া পল্টনে যে বাড়িতে বাস,

ওই বাড়ির পাশের আমার বন্ধুর বাড়ি। প্রায় নিত্যদিনই যেতুম। বিকেলে-সন্ধেয়। জয়নুল আবেদিনকে দেখতুম, কখনও বেরুচ্ছেন বা বাড়ি ফিরছেন।

দৈনিক সংবাদ-এর সাহিত্য সম্পাদকের দায় বর্তেছে ঘাড়ে। ঠিক করলুম, পয়লা বৈশাখে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত করবো। প্রচ্ছদে (প্রথম পৃষ্ঠায়) জয়নুল আবেদিনের আঁকা ছবি থাকবে। গেলুম তাঁর বাড়িতে। তিনশ' টাকা নিয়ে। অনুরোধ তথা আবদারে রাজি, তবে শর্ত, ফাইনাল প্রিন্টের আগে দেখিয়ে নিতে হবে। রঙে-রেখায় হেরফের হয়েছে কি না। কথায় মনে হলো, ছাপাখানায় খুব বিশ্বাস নেই। বিশেষথ ছবি ছাপার ক্ষেত্রে। ফাইনাল প্রিন্টের আগের দিন দেখাই। অতঃপর অনুমতি।

গড়িয়াহাটের সরকারি ফ্ল্যাটে শম্ভু মিত্রের বাস। এক সকালে গেছি। ড্রয়িংরুমে একটিই ছবি। বিশাল। বাঁধানো। শম্ভু মিত্র ওঁর নাট্যকণ্ঠ বাদ দিয়ে বললেন, জানো, এই ছবি জয়নুলসাহেব আমাকে স্বহস্তে প্রেজেন্ট করেছেন। ওঁর মতো শিল্পী বহুদেশেই দুর্লভ। আমরা গর্বিত। বাঙালির মনন-হৃদয়ে তিনি চিরকালীন। খুব বাড়িয়ে বলছি? না। যতদিন যাবে, বুঝবে।

এই লেখাটি লেখকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশ অনুচিত কাজ বলে গণ্য হবে।